Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 149 - 158
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে কলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্ত

ড. সুদীপ্ত চৌধুরী
গবেষক, অতিথি অধ্যাপক
যোগমায়া দেবী কলেজ ও চারুচন্দ্র কলেজ
Email ID: sudiptabengali87@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
20th century, Post-Colonial, Bengali Middle-Class Society, Realism, Kolkata, Socio-economic, Culture, Partition, Refugee.

Abstract
The root causes of the simultaneous crisis of life and livelihood of the Post-colonial Bengali middle-class society are actually hidden in the pages of successive historical documents at this time. It is the duty of a socially conscious writer to remove the dust layer of historical oblivion and keep a searching eye on them. Renowned storyteller Narendranath Mitra (1916-1975) devoted himself to this work. In fact, not only in his short stories but in his entire literary work, we can see the essence of realism of Bengali society of the 20th century. Kolkata has a special place in the geography of these faces and masks. Therefore, these stories deserve special importance in reviewing the history of Bengali middle class in contemporary Kolkata. On the other hand, Narendranath is also a faithful speaker of the complex equation created in the economic and social sphere by the partition of the country and the resulting refugee problem. Comprehensive reading of all these stories shows that sometimes, in terms of literary tendency, the author has travelled from the world of realism to the naturalist approach and sometimes back to the romantic cycle. Thuse in his composition, the life of the middle-class of Kolkata had caught thoroughly. Keeping these aspects in mind, we formulated this article. Apart from these, there are several historical informative lists and tables to witness the rise and fall of the contemporary economy and cultural assimilation which explain the situation of gradual increase in the refugee numbers in Bengal and its effects towards contemporary society. Thus, in the joint exercise of the testimony of the selected story on the one hand and the commentary of the historical facts on the other, we actually want to

understand the association of the Bengali middle classes' life and livelihood (special reference to Kolkata) from the reality of that particular period.

Discussion

বিশিষ্ট গবেষক-প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন – "মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা। কলকাতার মনও মধ্যবিত্তের মন..."[১] বাস্তবিকই উত্তর-ঔপনিবেশিক কাল, কলকাতা শহরের বিকাশ আর মধ্যবিত্ত এই তিন-এর এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর এই তিনটি বিষয়ই দাঁড়িয়ে রয়েছে যে বিশেষ পাল্টে যাওয়া অর্থনীতির ওপর। যার নির্যাসে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। এক কথায় তথাকথিত আধুনিক যুগ যেন মধ্যবিত্তেরই যুগ। ফলত এসময়ের সমাজ-রাজনীতির জটিল আবর্ত মধ্যবিত্তদের সামনে ব্যক্তিক স্তরে উন্নতি করার সুযোগ এবং অবনতিতে তলিয়ে যাওয়ায় চোরাবালি, - দুটি পথই খোলা ছিল। বিশেষত বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশটি বছর বাংলার বুকে ঘটে চলা নানা ঘটনার ঘনঘটার প্রত্যক্ষ প্রভাব, কলকাতার এই মধ্যবিত্ত জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করল। পর পর ঘটে যাওয়া দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ইত্যাদি আরো সব নেতিবাচকতার মধ্যে হয়তো একমাত্র আশার আলো জাগিয়েছিল জাতীয়তাবাদী স্বরাজ আন্দোলন। কিন্তু সাতচল্লিশের দেশভাগে সেই আশাপ্রদীপও হয়ে গেল নির্বাপিত। এর সঙ্গে যুক্ত হল উদ্বাস্তু সমস্যা। ফলত এই বিপুল জনসংখ্যার চাপে একদিকে যেমন বাড়তে লাগল কলকাতার ভৌগোলিক আয়তন, তেমনই অন্যদিকে কলকাতার জন-সংস্কৃতিতে যুক্ত হল নানাবিধ নতুন মাত্রা। পাশাপাশি এদের প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের মাঝখানে থেকে যাওয়া সুক্ষ্ম স্তরবিভাগটি, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল এবং ধীরে ধীরে তা বরাবরের জন্য; উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত নামের দুই বর্গে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এই সময়কার বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত *কল্লোল আন্দোলন* (১৯২৩-২৯) পরবর্তী যুগের বাংলা কথাসাহিত্যে কলকাতার নিম্নবিত্ত জীবনের পাশাপাশি মধ্যবিত্তের এই দুই উপস্তরের মন ও মানসিকতা আর তার সাধ ও সাধ্যের ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্কের যাপনচিত্রের বাস্তবতাও ফুটে উঠতে দেখা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনীশ ঘটক, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্ন্যাল, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখের গল্পে-উপন্যাসের একটা বড়ো অংশ সে সাক্ষ্যই দেয়।আর এই ধারারই সার্থক অনুবর্তন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) সাহিত্য (প্রায় ৫১টি গল্পগ্রন্থে বিধৃত চারশোর বেশি গল্প এবং ৩৮টি উপন্যাস রচনা করেছেন)। বিশেষত তাঁর রচিত গল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই মূল বিষয় সে-দিনকার উচ্চ-নিম্ন নির্বিশেষে তামাম মধ্যবিত্ত বাঙালির সামগ্রিক মনন ও তার জীবনালেখ্য। আসলে যশোরের সম্পন্ন গ্রামজীবন ছেড়ে, কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে পড়তে আসা এবং তারপর পিতৃবিয়োগ, জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের পাকিস্তান হয়ে যাওয়ায় আর বাস্তুভূমিতে না-ফেরা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ধীরে ধীরে অন্যান্য ছিন্নমূল পরিবারের মতোই তাঁরাও কলকাতার বাসিন্দা হয়ে উঠেছেন। এই সময় পর্বে কলকাতার একাধিক বসত বাড়িতে আরো পাঁচটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁদেরও একত্রে থাকতে হয়েছে। ফলত এই মধ্যবিত্ত জীবনের যাবতীয় শখ-স্বপ্ন, সুযোগসন্ধানী যুগপৎ উদারতা অথবা স্বার্থপরতা, আশা-হতাশা, চাওয়া-না-পাওয়া আর সেই জনিত বেদনা, দ্রোহ-প্রতিবাদ অথবা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মুখ বুজে মেনে নেওয়া; ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ছায়া ঘেরা অন্তরাল তাঁর অতি পরিচিত। সেই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রেই তাঁর রচিত নানান চরিত্রের খোলস ও ঘটনার আদল রচনা করেছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে 'গল্প লেখার গল্প'-এ বলেওছেন :

> "বাস্তব আর কল্পিত, রচিত আর স্বরচিত, সব মিলিয়ে এই গল্পগুলি যেন আমারই জীবনবৃত্ত ...আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখি, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার আনাগোনা কখনো রাজপথে কখনো সুড়ঙ্গ পথে। কখনো সেই পথরেখা চোখে দেখা যায়, কখনো বা তা দৃষ্টিগোচর হয়না। এই অগোচরতাই লেখকের নিজের পক্ষে বিস্ময়কর! এতেই তার সৃষ্টির আনন্দ।"[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৩৬ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৃত্যু ও জীবন' নামক গল্পটির মাধ্যমে কথাসাহিত্যের জগতে পদার্পণ করলেও কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ কালের সুচনা বিংশ শতকের চারের দশক। ওই বছরই দেশে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা মূক'। ১৯৪২-৪৩ সালে দেশ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস *'হরিবংশ'* [গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় নাম বদলে রাখেন *দ্বীপপুঞ্জ*]। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম *'অসমতল'* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। লক্ষণীয় গল্প গ্রন্থটির নামকরণ! পূর্বের অনুচ্ছেদেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি এই সমকাল ছিল কতটা বন্ধুর! বিশেষত মধ্যবিত্ত জীবন প্রভাবিত হয়েছিল দারুণ ভাবে। মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেয়েছিল অনেকটাই, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল পাইকেরি মূল্যসূচকও। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারে খাদ্যশস্য ও ভোগপণ্যের মজুতদারি বাড়তে থাকায় সারা ভারতেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল। এক সমীক্ষা অনুযায়ী বিংশ শতকের চারের দশকের ভারতের বাজারে পাইকারি মূল্য সূচক বৃদ্ধির চেহারাটি ছিল এই রকম[৩] —

বৎসর	মূল্য সূচক
১৯৩৯-৪০	৮৮.১৪
১৯৪০-৪১	৯৬.৯
১৯৪১-৪২	১১৯
১৯৪২-৪৩	১৬২.৮
১৯৪৩-৪৪	১৮০.১
১৯৪৪-৪৫	১৮২.৪
১৯৪৫-৪৬	১৯৯.১
১৯৪৬-৪৭	২২১.৯

১৯১৪ সালে মূল্য সূচক ১০০ ছিল ধরে নিয়ে

ফলত নিত্য প্রয়োজনীয় থেকে অন্যান্য জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেতে লাগল লাফিয়ে লফিয়ে। যুদ্ধের বাজারে লোহা সহ অন্যান্য ধাতুর চাহিদা হঠাৎ অন্তত বেড়ে যাওয়ায় গৃহনির্মাণ দ্রব্যের দাম বেড়েছিল ৪০০-৬০০ শতাংশ, গৃহস্থালীর বাসনপত্র ও চাষের যন্ত্র পাতির দাম বাড়ে ৩০০-৪০০ শতাংশ। এর পাশাপাশি খাদ্যশস্য, মুদিখানার দ্রব্য, শাক-সব্জি সবকিছুরই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে বাংলায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত এক সমীক্ষায় দেখা যায়[৪] -

জিনিস	পরিমাণ	১৯৩৯ সালে দাম ছিল	১৯৪৩ সালে দাম বেড়ে হল
চাল [সাধারণ]	প্রতি মণ	৩ টাকা ১২ আনা	১০৫ টাকা
ময়দা	প্রতি মণ	৭ টাকা	২৫ টাকা
চিনি	প্রতি মণ	৭ টাকা	৬০ টাকা
মুসুর ডাল	প্রতি মণ	৬ টাকা	২২ টাকা
ছোলা	প্রতি মণ	৪ টাকা ৮ আনা	২৫ টাকা
কোক কয়লা	প্রতি মণ	৭ আনা ৬ পাই	৫ টাকা ৮ আনা
কেরোসিন তেল	১ টিন	৪ টাকা ৮ আনা	২০ টাকা
সরিষার তেল	প্রতি সের	৭ আনা ৬পাই	২ টাকা
নারকেল তেল	প্রতি সের	৫ আনা	৩ টাকা
দুধ	প্রতি সের	৩ আনা ৬ পাই	১২ আনা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লবণ	প্রতি সের	১ আনা ৬ পাই	১ টাকা ২ পাই
মাছ	প্রতি সের	৬ আনা	২ টাকা
ডিম	প্রতি সের	৭ আনা	১ টাকা ৮ পাই
আলু	প্রতি সের	২ আনা	১ টাকা ৬ পাই
সুপারি	প্রতি সের	৬ আনা	২ টাকা
কাপড়	১ জোড়া	১ টাকা ১০ আনা	১৫ টাকা
কাগজ	১ দিস্তা	২ আনা	১ টাকা ২ পাই
কালি	১ বোতল	৬ আনা	২ টাকা ৪ আনা
কলমের নিব	১ ডজন	২ আনা	৩ টাকা ১২ আনা
দেশলাই	১ ডজন	২ আনা ৬ পাই	২ টাকা
সাবান	১ টি	১ আনা ৬ পাই	৮ আনা

ঐতিহাসিক ভাবে বাংলার ৭০ শতাংশ মানুষের ছিল কৃষিনির্ভর জীবিকায় অভ্যস্ত। কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় খন্ডে ১৯৫১ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় বাকি ৩০ শতাংশ মানুষের মধ্যে শ্রমিক বা বড়ো ব্যবসায়ী শ্রেণি বাদ দিলে মাত্র ৯ শতাংশ মানুষ অন্যান্য জীবিকার নিয়োজিত ছিলেন। আর এরাই হলেন (ছোট ব্যবসায়ী, সরকারী, বেসরকারি কর্মী, শিক্ষক, কেরানি ও অন্যান্য কর্মচারী ইত্যাদি) এই উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির আওতাধীন। এই যে লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তার ফলস্বরূপ নিদারুণ আর্থিক আঘাতে কলকাতার সেদিনকার মধ্যবিত্ত জীবন এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলযে অনেক ক্ষেত্রেই আর একার রোজগারে সংসার প্রতিপালন সম্ভব হচ্ছিল না। ফলত অনেক পরিবারেরই শিক্ষিতা গৃহবধূরা চাকুরি নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় এদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষদের রক্ষণশীল মানসিকাতার সঙ্গে বিরোধ তৈরি হচ্ছিল। বদলে যাওয়া অর্থনীতির আবর্তে সৃষ্ট পারিবারিক মননের ঘাত-প্রতিঘাতের সেই বাস্তবিক ছবিই আমরা ফুটে উঠতে দেখি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের *'অবতরনিকা'*, *'সেতার'*, *'ছোট দিদিমণি'* ইত্যাদি গল্পে। *'অবতরনিকা'* গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের আনন্দবাজার পূজা সংখ্যায়। বিয়ের আগে ম্যাট্রিক পাশ করা আরতিকে কলেজের পড়া চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেননি শ্বশুর প্রিয়গোপাল। বরং

> "পুত্রবধূকে পুজোর ঘর থেকে গোয়াল ঘর পর্যন্ত সব দেখিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন : 'সব ভার এবার থেকে তোমার মা। স্কুল বল, কলেজ বল। সংসারের চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর নেই। এখানে হাতে-কলমে যা শিখবে, দশটা ইউনিভার্সিটি সাধ্য নেই তা শেখায়।"[৫]

উচ্চশিক্ষার বদলে নারীদের পূজার ঘর থেকে গরুর গোয়াল পর্যন্ত সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার মানসিকতাটির প্রতি খোঁচাটি এখানে লক্ষণ। প্রিয়গোপাল মজুমদার পূর্ববঙ্গে জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি করতেন আর তাঁর ছেলে সুব্রত কলকাতা শহরে চাকরি নিয়েছে ব্যাংকে। এ বৃত্তান্তেও সেই পুরাতন ধারার পরিবর্তে নতুন সময়ধারার আগমনবার্তা লুকিয়ে আছে। প্রাচীন জমিদারি প্রথাটি স্বাধীন ভারতের আস্তে আস্তে উঠে যাবে, অবসান হয়ে যাবে একটি যুগের, আসবে ব্যাঙ্ক, সদাগরী আপিসের দিন; সেটাই আবার ধীরে ধীরে বয়ে এনেছে আজকের কর্পোরেট কর্ম-সংস্কৃতিকে। অর্থনীতির বিবর্তনের পাশাপাশি জীবিকারও পরিবর্তনের ঐতিহাসিক কারণটিকেও লেখক যেন ধরে রেখেছেন। পূর্বের যুগটা ছিল গ্রামীণ স্বামন্ততন্ত্রের আর এই যুগটা হল শহুরে পুঁজির। ফলে বিরোধ ঘটতে বাধ্য। পাশাপাশি এই বিরোধে আরতি প্রাথমিকভাবে সুব্রতকে পাশে পেলেও কিছুদিন বাদেই বেরিয়ে সুব্রতর মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে মধ্যবিত্তের পুরুষতন্ত্রের নগ্ন মুখটা। বাইরে থেকে প্রগতিশীল সাজলেও, নারীর সমাধিকারের প্রশ্নে মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষ যে এখনো, সেই মধ্যযুগীয় মানসিকতারই অনুগমন করে; তার ছবি ফুটে উঠতে দেরি হয়নি। ফলত শুরু হয়েছে ক্রমাগত আরতিকে চাকরি ছাড়ার জন্য সুব্রতের চাপ দেওয়া। আসলে সংসারের সর্বত্র আরতি ছিল সুব্রতের স্ত্রী কিন্তু একমাত্র আরতির অফিসে সুব্রতের পরিচয় হয়ে উঠেছে আরতির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বামী। এই আত্মপরিচয়ের বদলটি কোথায় যেন খোঁচা দিতে থাকে সুব্রতর মনে। অনুষ্ঠান করে 'ভাত-কাপড়ের' দায়িত্ব নেওয়া স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত হতে কুণ্ঠিত হতে থাকে তার অন্তঃকরণ।কলহ এতদূর গড়ায় যে আরতির পিতাকে সে ফোন করে সমস্ত নালিশ করে বসে এবং আশ্চর্য পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা! আরতির পিতাও আরতিকে কাজ ছাড়ার কথাই বলে। অবশ্য পুরুষতন্ত্র যে শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তা নয় নারীদের মধ্যে কীভাবে সক্রিয় থাকে তার প্রমাণ আমরা পাই সরোজিনী অর্থাৎ আরতির শাশুড়ির চরিত্রে।এইভাবে ঘনিয়ে ওঠার সমস্যার মাঝেই হঠাৎ করে চাকরি চলে যায় সুব্রতর এবং এতদিনকার আরতির চাকরি কেন্দ্রিক যে আপত্তি সেই মানসিকতাটাও যায় বদলে। সকলেই তখন উদ্‌গ্রীব আরতির চাকরির রোজগারটুকু বাঁচিয়ে রাখতে! এমনকী আরতির কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলে স্বামী সুব্রতই তাকে পরামর্শ দেয় আপোস করে চলার। কারণ এই মুহূর্তে আরতির রোজগারটুকুই যে ভরসা। আসলে এইভাবে অর্থনীতি কোথাও গিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত মন-মনস্তত্ত্ব-মানসিকতা--সমস্ত কিছুকেই যে নিয়ন্ত্রণ করে; তার সার্থক প্রমাণ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই গল্পটি। তাই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিবাদ জানিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া আরতিকে স্বামীর কাছে হয়ে থাকতে হয় 'সেন্টিমেন্টাল বাঙ্গালী মেয়ে'! পাশাপাশি 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত (বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৫২) *'সেতার'* গল্পটিতেও দেখি সুবিমলের দীর্ঘ অসুস্থতার সময় গৃহবধূ নীলিমা, শ্বশুর-শাশুড়ির অমতেও বাধ্য হয় গানের টিউশনি নিতে। পরবর্তীতে সে সেতার শেখাতেও শুরু করে কারণ 'বাজনা জানা থাকলে টিউশানিতে আরো বেশি টাকা পাওয়া যায়' – এই যে পরিস্থিতির চাপে কলাবিদ্যাকে রোজগারের মাধ্যম হিসাবে দেখা এই মানসিকতাটি আসলে সেই মধ্যবিত্ত মননেরই পরিচায়ক। আমাদের সকল কিছু শিক্ষার পেছনে আসলে ভবিষ্যতে তার মাধ্যমে কতটা উপার্জন হবে এই চিন্তার রেশটি থাকে লুকিয়ে। পাশাপাশি সুবিমলকে নিয়ে চেঞ্জে যাওয়ার পরিকল্পনায়, অতি কষ্টে উপার্জিত টাকার একটা পরিমাণ সঞ্চয়ের দিকটিও প্রমাণ করে যে, এই মধ্যবিত্ত মনটির মধ্যে এখনো কিছুটা হলেও রোমান্টিকতা বেঁচে আছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে লগ্ন পুরুষতন্ত্রের মুখটাও ফুটে ওঠে এগল্পেও। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে সুবিমল প্রথমেই নীলিমার জলসায় বাজাতে যাওয়া আটকায়। আর এটি আটকাতে সে যাকে বলে ইমশোন্যাল ব্ল্যাকমেল পর্যন্ত করতে ছাড়ে না। জলসার আয়োজকরা নীলিমার সদর দরজায় কড়া নাড়ছে, আর সুবিমল দোর ভেজিয়ে বলে ওঠে –

> "সুবিমল বলল, 'না নীলিমা, আজই। রোগের বীজ আজ হয়তো চাপা আছে, কালই যে আবার ভেসে উঠবে না তার ঠিক কি? ডাক্তারের কথায় অত সহজে ভুলো না; তুমি বাজাও নীলিমা, আমি আজই একটু শুনব। তোমার সুর বেচে কেবল তুচ্ছ টাকাই এতদিন দিয়েছ, আজ এত অল্পতে ভোলাতে পারবে না। আজ তোমার সেই আসল সুর আমাকে শোনাতেই হবে।"[৬]

সুবিমল যেন ভুলেই গেছে যে নীলিমার এই 'সুর বেচা তুচ্ছ টাকা'তেই এতদিন তার চিকিৎসা চলেছে, গড়িয়েছে সংসারের চাকা!

১৩৬০ বঙ্গাব্দের 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত *'ছোটদিদিমণি'* নামক গল্পটিতে অথবা ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'মুখপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত *'এক পো দুধ'* গল্পেও সেদিনের কলকাতার মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও পুরুষতন্ত্রের মিলিত পরিণামের ছবি আছে। পাশাপাশি এসেছে সেদিনের অর্ধাহার, অপুষ্টি, বেকারত্ব আর হতাশার ছবিও। সাতাশ-আঠাশ বছর বয়েসে দুই সন্তানের মা রেবা বনমালী বিদ্যাপীঠে 'অনেক ধরাধরি অনেক সুপারিশের পর' চল্লিশ টাকার সামান্য মাইনের কেরানীর চাকরি পায়। এতে একমাত্র সান্ত্বনা হল – স্বামী অজয়ের একার আয়ে সংসার সেভাবে চলছিল না। যদিও বাস্তবটি হল -

> "রেবার চল্লিশ টাকা কেন, এতগুলো মানুষের পেট অজয়য়ের আশি টাকায় ভরে না। এতদিন তো প্রায় আধপেটা খেয়েই কেটেছে। রেবা মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করে আনবার পর দু-বেলা দু-মুঠো জুটছে বাচ্চাগুলোর। না, নিজের মাইনে দিয়ে সংসারের আর কোন স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পারেনি রেবা। ভালো শাড়ি পরে যেতে পারেনি, দামী আসবাবপত্র কিনতে পারেনি। শুধু খোরাক পোশাকটা একটু ভদ্রলোকের মত করার চেষ্টায় সব টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। আগে এই চল্লিশ টাকা না হলেও চলত। এখন আর চলে না।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অন্যদিকে 'এক পো দুধ' গল্পেও বিনোদ আর লতিকার চরম টানাটানির গার্হস্থ্য জীবনে তিনটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছে আগেই। আছে কেবল ক্লাস ফাইভের সুনীল আর খুকি। পটলডাঙ্গা স্ট্রিটের বাণী পাবলিশিং-এর প্রুফ রিডার বিনোদ দাস, সংসারের খরচ চালাতে মাঝে মাঝে কয়েকটি টিউশনি করতেও হয় এছাড়াও ইন্সুরেন্সের এজেন্সি আছে, আছে ঘাড়ের ওপর বেকার ভাই, রোজগার সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকা। ফল সকলকে নিয়ে কায়ক্লেশে দিনানিপাত। তাকে দেখে মনে হয়-

> "খাটতে খাটতে লোকটির চেহারা একেবারে হাড্ডী সার হয়ে গেছে। এই তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর মোটে বয়স। এরই মধ্যে বিনোদের দুগাল ভেঙেছে, চোয়াল জেগেছে, কেমন যেন বুড়ো বুড়ো হয়ে গেছে দেখতে। লোকটির দিকে যেন আর তাকানো যায় না।"[৮]

লতিকার অবস্থাও তথৈবচ। আর এই অবস্থা কোনও বিচ্ছিন্ন পরিবারের নয় বরং সার্বিক তার প্রমাণ মেলে প্রতিবেশী ফটিককে দেখে সুনীলের ভাবনায়—

> "ফটিক মাথা নিচু করে পড়া টুকছে। কালো রোগা চেহারা। কির-কির করছে হাড়গুলো। পিঠের দুটো হাড় গরুড় পাখির দুই ডানার মত উঁচু হয়ে রয়েছে।"[৯]

অর্থাৎ একদিকে যুবা অন্যদিকে কিশোর সকলেই ভুগছে অপুষ্টিতে! এই সার্বিক অপুষ্টির ছবি সেইসময়ের বাঙালির পুরো জনস্বাস্থ্যকে যেন আমাদের চিনিয়ে দেয়। এহেন পরিস্থিতিতেও লেখকের মূল অভিনিবেশ যেন সেই মধ্যবিত্তের মনটিকে ঘিরে। তাই আমরা দেখতে পাই সংসারে অনেক কষ্টে অতিরিক্ত এক পো দুধের যে বন্দোবস্ত করা হয় বিনোদের জন্য; তা অন্যদের ফেলে নিজে খাওয়ার সময় বিনোদের প্রাথমিকভাবে অস্বস্তি বোধ হতে থাকলেও; কিছুদিন বাদেই সে অস্বস্তি কেটে যাওয়ার ছবির মাধ্যমে লেখক যেন মধ্যবিত্তের সেই ব্রীড়া বা সংকোচের মুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন। এবং আমরা দেখতে পাই বিনোদ নিঃসঙ্কোচে নিজের ভাই বা সন্তানের সামনে নিজেই দুধ চেয়ে নিয়ে খাচ্ছে। আসলে এ সময় সে হয়ে উঠেছে এই পরিবারের সর্বময় কর্তা সেই কারণে সে ভাবছে -

> "কিন্তু বিনোদ দাস বাইরে যতই অকিঞ্চন হোক ইন্টালির এই অনরেট সেকেন্ড লেনের ৭/৩/২ - এর একতলা বাড়ির কোণের দিকের ঘরখানার শেষ সম্রাট। সংসারের সর্বময় কর্তা। এই সংসারের জন্য সে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিচ্ছে, আর এক কাপ দুধে তার অধিকার নেই! নিজের রোজগারের পয়সায় সে নিজে দুধ খাবে তাতে অত লজ্জা কিসের?"[১০]

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে বিনোদ এই দুধটুকুকে তার অধিকার বলে ধরে নিচ্ছে। আর মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষ; সে যদি হয় সংসারের একমাত্র রোজগেরে, তাহলে তার অধিকারবোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ফলত এই দুধের অধিকার নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সাংসারিক অশান্তি। কোনদিন সেই দুধ তার সন্তান অথবা ভাইকে দিয়ে দিলে বিনোদ মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়। অবশেষে যেদিন লতিকা সেই দুধ ভক্ষণ করে সেই দিন তার ধৈর্যের বাঁধ যায় ভেঙ্গে। লতিকাকে চূড়ান্ত অপমান করে বলে ওঠে –

> "এঁটো হাতেই বিনোদ রুখে এল,'লজ্জা করবে কেনরে হারামজাদী? আমি কি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই, নিজের পয়সায় খাই--নিজে খাই আমি। লজ্জা তোদের করা উচিত।"[১১]

মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে প্রায় সমার্থক হয়ে জড়িয়ে থাকে মানসিক দ্বন্দ্ব। সমস্ত কাজে, পরিকল্পনায়, সিদ্ধান্তে, অনুশোচনায় বরাবর লগ্ন হয়ে থাকা এই দ্বন্দ্ব মধ্যবিত্তের জীবন-নিয়তি। তবে এই দ্বন্দ্ব যে শুধুই মানসিক জাড্য থেকে আসে তা নয় – বরং বলা যেতে পারে বিশাল কিছু করার একটা স্বপ্ন অথচ বাস্তবে তার সঙ্গে নানা কারণে পেরে না ওঠা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ কারণ অর্থনৈতিক) - এই চক্রব্যূহের ঘূর্ণাবর্তের সহোদর হিসেবে মধ্যবিত্ত জীবনে নেমেসিসের মতোই তার অবস্থান। মধ্যবিত্তেরা বারবার তার দংশন থেকে মুক্তি পেতে চায়, ঝেড়ে ফেলতে চায় কিন্তু বারবার সেই দ্বন্দ্বেরই বহুমুখী বিন্যাসের শিকার হতে হয় তাদের। মধ্যবিত্ত জীবনের এই নিদারুণ জীবন সত্যের ছবি নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্পেরই মৌলিক ভাবনাবীজ নির্মাণ করেছে। এদের মধ্যে 'অলকা' পত্রিকায় ১৩৫০ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত *'মহাশ্বেতা'* গল্পটি অন্যতম। পাশাপাশি গল্পটিতে মধ্যবিত্তের রোমান্স প্রিয়তার নিদর্শনও বটে! তবে এই রোমান্সের মূল ভিত্তিভূমি শুধুমাত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দু'জন নর-নারীর নয়, বরং পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলতে এসেছে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ। পাঁচ বছরের বৈধব্য ছেড়ে স্কুল শিক্ষিকা অমিতার নতুন বিবাহ করার পূর্বে, মনের ভিতরকার দোলাচলদীর্ণ দ্বন্দ্বের ছবিটি এখানে আসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে চিন্মোহনের বাড়িতে, অকাল বৈধব্যের শিকার অমিতাকে, পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নিতে না পারা চিন্মোহনের মাতা, অন্যদিকে তার দাদার শুধুমাত্র সমাজে নিজেকে প্রগতিশীল হিসাবে প্রমাণ করতে এই বিবাহ সমর্থন— একই সঙ্গে যেন বাঙালির মুখ আর মুখোশকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। আর এদের মধ্যেখানে এই দুই মধ্য যৌবনের নব-দম্পতির; নতুন এই সম্পর্কটির রোমান্টিকতা, যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে থাকে। সুন্দর একটি প্রতীকের সাহায্যে এই দ্বন্দ্বের ছবিটিকে তুলে ধরেছেন লেখক। বিবাহের পূর্বে অমিতার শ্বেত-শূভ্র বসনের নম্র পেলব আবেদনে মুগ্ধ হয়ে রোমান্টিক চিন্মোহন তার নাম রেখেছিল মহাশ্বেতা। সেই চিন্মোহনই, তাদের বাসর রাতে রঙিন সাজে অমিতাকে দেখে চমকে ওঠে – এই অমিতাকে অচেনা লাগে তার, মুহূর্তে ভেঙে খান খান হয়ে যায় এতদিন তিলতিল করে গড়ে ওঠা মহাশ্বেতার 'পুষ্পিত ইমেজ'!

পাশাপাশি এই সময়ের অন্য একটি বড়ো সমস্যা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ, পাকিস্তান হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে হিন্দু পরিবারের উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলে আসা। বঙ্গবিভাগের পর ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৭০ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষের মতো পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষ ছিন্নমূল হয়ে কলকাতাসহ সারা পশ্চিমবাংলায় এসেছেন। বিখ্যাত উদ্বাস্তু সংগঠক অনিল সিংহ *পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যা* [১২] নামক প্রবন্ধে জেলাওয়ারী যে হিসেব তৈরি করেছেন তা নিম্নরূপ –

জেলা	উদ্বাস্তু সংখ্যা
চব্বিশ পরগনা (উত্তর-দক্ষিণ)	১৬,৫০,০০০ জন
নদিয়া	১৫,০০,৭৫০ জন
কলকাতা	৯,০০,০০০ জন
কোচবিহার	৪,৪২,০০০ জন
দিনাজপুর (উত্তর-দক্ষিণ)	২,৯২,৫০০ জন
জলপাইগুড়ি	২,৪৯,০০০ জন
বর্ধমান	২,৪০,০০০ জন
বাঁকুড়া	১৪,১৫,৭৫০ জন
হুগলি	১,৫৯,০০০ জন
হাওড়া	১,৪৪,০০০ জন
মুর্শিদাবাদ	১,৩৫,০০০ জন
মালদা	১,২৭,০০০ জন
মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)	৬৩,০০০ জন
দার্জিলিং	৪৮,০০০ জন
বীরভূম	৩,১৫,০০০ জন
পুরুলিয়া	৯৭৫ জন
মোট	**৫৯,৯৯,৪৭৫** জন

তাদের একটা বড়ো অংশ, কলকাতার লোক-বসতির চাপ বৃদ্ধি, বাড়িভাড়া ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অন্যান্য নানা কারণে কলকাতার বাইরের শহরতলিতে বসতি স্থাপন করেছে। এছাড়াও দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জনের মত শিল্পনগর অঞ্চল গড়ে ওঠার ফলে সেই দিকে চলে গেছে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তীশহরতলী নিয়ে গড়ে উঠেছে বৃহত্তর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কলকাতা। এই বৃহত্তর কলকাতায়, ১৯৭১ সালের সেনসাস অনুযায়ী ৭৪টি নগর অঞ্চল এর মধ্যে ঢুকে গেছে। এবং তাতে মোট লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭১ লক্ষ।[১৩]

এ-পাড় বাংলায় চলে আসবার পর সেই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির, এতদিনকার নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে হঠাৎ যে আলোড়নের সৃষ্টি হল তারপ্রতিক্রিয়ার নেতিবাচক অথবা ইতিবাচক দ্বৈতরূপই যে মধ্যবিত্ত মনে ছায়া ফেলেছিল তা নরেন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের গল্পগুলিতে ফুটে উঠতে দেখা যায়। বিশেষত উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় *কাঠগোলাপ* গল্পের কথা [প্রথম প্রকাশ- আনন্দবাজার পত্রিকা পূজা সংখ্যা ১৩৫৫] –

> "অনেক খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই শহরতলিতে এসে ঘর মিলেছে একখানা, একতলায় স্যাঁৎসেতে ঘর, চুন-বালি-ঝরা কতকালের পুরনো দেওয়াল জোরে বৃষ্টি নামলে ছাতচুঁয়ে জল পড়ে। জায়গায় জায়গায় ঘটিবাটি পেতে রাখতে হয় ধরবার জন্য। জানালা দু'টি আছে বটে, কিন্তু খুলবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা নর্দমার গন্ধ আছে। বাথরুমটা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। কল-চৌবাচ্চা নিয়ে তিন ঘর ভাড়াটে আর উপরের বাড়িওয়ালার সঙ্গে মারামারি কাড়াকাড়ি। নোংরা-ভরা উঠান। মশা আর দুর্গন্ধ ভরা ঘর। গন্ধে গানে এই তো কলকাতা।
>
> তবুও তো রাজধানী। তবুও তো শহরে এসেছে অণিমা। তার মুখে শহর ছাড়া আর কথা নেই, তার চোখে শহর ছাড়া বস্তু নেই দেখাবার। অণিমা প্রায়ই বলে,'শাপে বর হ'ল। ভাগ্যে পাকিস্তানের হাঙ্গামা হল দেশে, হিড়িক লাগল গ্রাম ছাড়বার। নইলে কি আনতে, নইলে কি আসতে পারতুমকলকাতায়? এমন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে বাস করতে পারতুম? সারাটা জীবন গাঁয়েই ফেলে রাখতে।"[১৪]

এই উদ্বাস্ত জীবন নিয়ে অনেকগুলি গল্প লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। তবে সব থেকে শ্রেষ্ঠ *'হেডমাস্টার'* [প্রথম প্রকাশ দেশ, পূজা সংখ্যা ১৩৫৬]। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত ভারত বিষয়ক একটি গ্রন্থে একমাত্র এই গল্পটিরই অনুবাদ স্থান পেয়েছে। আসলে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে শুধু মধ্যবিত্ত উদ্বাস্ত জীবনের ছবিটিই তুলে ধরা হয়নি বরং বাঙালি শিক্ষকের মূল্যবোধ, তার আদর্শে অবিচল থাকা, সবটা মিলিয়ে তার সম্পূর্ণ শিক্ষকসত্তার অনুপম প্রকাশ ঘটেছে। এ গল্প আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে শিক্ষকতা শুধু একটা পেশা নয় বরং একটা আদর্শের নাম। জাতির জীবনে সঠিক শিক্ষক ও তার মার্গ-দর্শন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থার ফেরে পূর্ববঙ্গের সাগরপুরের এম. ই. স্কুলের হেডমাস্টার একান্ন বছরের কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার সপরিবারে আজ কলকাতার রিফিউজি, থাকেন কলকাতার কালীঘাট বস্তির টিনের ঘরে। এসেছেন একসময়ের ছাত্র ব্যাংকের উচ্চপদে আসীন নিরুপম নন্দীর কাছে একটা চাকরির আশায়।অথচ এক সময় স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষার জন্য এই মাস্টারমশায়ের বাড়িতেই থেকে পড়াশোনা করেছেন নিরুপম। সময়ের ফেরে, দেশ-মানচিত্র-ভূগোল যেমন বদলে গেছে তেমনই বদলে গেছে সামাজিক অবস্থান, পেশা আর সম্মান। গাঁয়ের স্কুলের হেড মাস্টার শহরে এসে আর তাই মাস্টারী করতে চাননি। হয়তো খানিকটা অভিমানেই। নিরুপম অনেক চেষ্টা করে তাকে তার ব্যাংকে ঢুকিয়েছে। কিন্তু যে যে ডিপার্টমেন্টেই তাকে দেয়া হোক না কেন তার নামে কিছুদিন যেতে না যেতেই নালিশ আসতে শুরু করে। আসলে বাইরে তিনি অন্য পেশা গ্রহণ করলেও তাঁর অন্তঃকরণ তো একজন পুরোপুরি শিক্ষকের; সেই কারণে তিনি যে ডিপার্টমেন্টেই কাজ করেন সেখানে এতটুকু অনিয়মানুবর্তীতা, বিশৃঙ্খলা মেনে নিতে পারেন না। সব বিষয়ে খুঁত ধরতে চান। আসলে একজন প্রকৃত শিক্ষক হন 'পারফেক্‌শনিস্ট'। আর তাঁর সেই পারফেক্‌শনিস্ট সত্তা তাঁর মনে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে চলা নানা অসংগতির দিকটি নিয়ে অসন্তোষের জন্ম দিতে থাকে। ফলে তিনি প্রতিবাদ করতে থাকেন। সে কারণেই কোথাওই টিঁকতে পারেন না। এইভাবে কয়েকমাসের মধ্যে নানা ডিপার্টমেন্টে ঘোরাতে ঘোরাতে যখন সব ডিপার্টমেন্ট থেকেই তিনি বিতাড়িত হলেন, তখন বাধ্য হয়ে নিরূপম তাঁকে বেয়ারাদের নজরদারীর কাজ দেন। আর এইখানে এসে বদলে যায় নালিশের অভিমুখ। শোনা যায় যে তিনি বেয়ারাদের কাজের খুঁত সেভাবে ধরছেন না বরং তাদের প্রতি কেউ অন্যায় করলে, কোনো ব্যক্তিগত কাজে তাদের ব্যবহার করলে তিনি তার প্রতিবাদ করছেন। এইভাবে চলতে চলতে একদিন ছুটির পর নিরুপম যখন কাজ থেকে বেরোচ্ছে তখন সে দেখে মাস্টারমশাই বেয়ারাদের ঘরে বেয়ারাদেরদের নিয়ে পড়াতে বসিয়েছেন। তাকে দেখে অপরাধীর মতো তিনি বলেন যে অফিস ডিসিপ্লিনটা ভালো করে আয়ত্তে আনার জন্য সবথেকে যেটা বেশি দরকার সেটা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 149 - 158
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হল শিক্ষার। আর সে শিক্ষা যদি ঠিকঠাক হয় তবে অফিসের পরিবেশটাই যায় বদলে। এদের মধ্যে থেকে তিনি কানাই নামে এক বেয়ারাকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন। আসলে জহুরী যেমন ঠিক রত্ন খুঁজে নেন তেমনি তিনিও এই বেয়ারাদের মধ্যে, যাদের কেউ গুরত্বই দেয় না, তাদের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করেছেন কানাইকে। তার সম্পর্কে তিনি বলছেন -

> "মাস্টারমশাই বললেন, 'অদ্ভুত মাথা। ইংরেজি বল, অঙ্ক বল, সব বিষয়ে সমান উৎসাহ। এই সব ছেলেকে দিয়েই স্কলারশিপের এটেম্পট নিতে হয়। প্রায় ক্লাস সিক্সের স্ট্যান্ডারে আছে। জানো, খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট করে তোলা যায়।"[১৫]

আসলে তিনি তো শিক্ষক, তিনি হলেন মানুষ গড়ার কারিগর, তাই যখন কোনো মানুষের মধ্যে সামান্যতম উন্নতির সম্ভাবনা কোনো প্রকৃত শিক্ষক দেখতে পান; তখনই কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বিরাট মহীরুহে পরিণত করার স্বপ্নটা তাঁকে চেপে বসে এবং তিনি নিজের গরজেই সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করেন। এটাই তো প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষণ। তাতে তাঁর সামনে স্কুল-কলেজের মতো পড়ানোর সুবিধা থাক বা না-থাক, আসুক হাজার বাধা, সব ঠেলে তিনি এগিয়ে যাবেনই আপন লক্ষ্যে। একারণেই তো শিক্ষকদের জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। কাহিনীর এই শেষাংশে শ্রদ্ধায় আমাদেরও মাথা নুইয়ে আসে। আসলে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বেশিরভাগ গল্পগুলি শেষ হয় এই রকম এক আশাবাদী সুরে। জীবন নানা কারণে নানা ভাবে বিপর্যস্ত হলেও মানুষের লক্ষ্য তিমির বিনাশী হতে চাওয়া, যাপনের এই ধ্রুবপদ থেকে কখনো বিচ্যুত হননি লেখক। তাই দেখি তিনি তাঁর *'গল্প লেখার গল্পে'* নিজেই জানিয়েছিলেন -

> "নিজের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সংকীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা, তবু তা ভালবাসা ছাড়া কিছু নয়।"[১৬]

বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে অনেক কিছু না-পাওয়া হয়তো ছিল, ছিল অনেক কিছু অসংগতি; কিন্তু তবুও তার মনে এই এক ধরনের জীবনকে ভালবাসা তখনও বেঁচে ছিল। আর ছিল কিছু কিছু মূল্যবোধ, আদর্শবাদিতা। তবে আজ আর সে মনটি বেঁচে আছে কিনা... সে বিচার করবে ভবিষ্যৎ!

Reference:

১. ঘোষ, বিনয়, 'মেট্রোপলিটন মন : মধ্যবিত্ত : বিদ্রোহ' , দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রা লি, ১৯৭৭, পৃ. ১০
২. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, 'গল্পমালা-১', চতুর্দশ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২২, পৃ. ৯
৩. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার, 'বাংলার আর্থিক ইতিহাস : বিংশ শতাব্দী (১৯০০-১৯৪৭), দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১১, পৃ. ১৩৬
৪. তদেব, পৃ. ৭৯
৫. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৫
৬. তদেব, পৃ. ৫১
৭. তদেব, পৃ. ৩২২
৮. তদেব, পৃ. ২৬৪
৯. তদেব, পৃ. ২৬৯
১০. তদেব, পৃ. ২৬৬
১১. তদেব,পৃ. ২৬৮
১২. চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা, "উদ্বাস্তুস্রোত ও পশ্চিম বাংলার জনজীবন", স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা), 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক বিপণি, ২০২০, পৃ.১৭৩

১৩. ঘোষ, বিনয়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০৬-২০৭

১৪. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৯

১৫. তদেব, পৃ. ১৫৬

১৬. তদেব, পৃ. ১১